সমকালীনতায় - "উলঙ্গ রাজা"

দ্বৈপায়ন চক্রবর্তী

একটি কাব্যগ্রন্থ, যা আজও সমকালীন চরিত্রের বুনোটে, সময়ের দ্যোতনায়, দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নিজের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেছে সাবলীলভাবেই। হ্যাঁ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর "উলঙ্গ রাজা" কাব্যগ্রন্থ। ঘটনাবহুল ১৯৭১ সালে মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতা নিয়ে যা প্রকাশিত হয় জুলাই মাসে।

সব তন্ত্র আদপে প্রতিক্রিয়াশীল, তা সে সমাজ হোক কিংবা মানব শরীর, এবং এই প্রতিক্রিয়াশীলতার কারিগর হোলো অনুঘটক, অনুঘটক যদি তন্ত্রের সাম্য রক্ষা করে তবে তা সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু যখন অনুঘটক তন্ত্রের সাম্য রক্ষা না করে তখন সেই অনুঘটককে রোগ বলে ধরা হয় এবং তন্ত্রের সাম্য ফিরিয়ে আনার নামে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, সেই পদ্ধতি এবং রোগ তন্ত্রের কোন শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটার স্পষ্ট নির্দেশনা না পাওয়া গেলে পুরো বিষয়টাই ধোঁয়াশায় ভরা আর পরিস্থিতি ঘোলাটে,এই বিষয়টাই আমরা খুঁজে পাই "উলঙ্গ রাজা" কাব্যগ্রন্থে "লক্ষণ বিচার" কবিতাতে যেখানে ডাক্তার শরীর তন্ত্রের অসাম্যের কারণ বুঝে উঠতে পারেন নি কারণ সেক্ষেত্রে ওষুধ নামক পদ্ধতি, রোগ সারাবার স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে নাকি রোগকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পুষ্ট করেছে সে বিষয়ে দ্যোতনাটা রয়েই গেছে, কোনো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। আবার সমাজের রোগ সারাবার পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত পটকা সমাজের স্বার্থে ব্যবহৃত নাকি ব্যক্তি অথবা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহৃত সেই বিষয়তেও কোনো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়না, যখন বাবার" লক্ষণ ভালো নয়" এর জবাবে ছেলে বসে ওঠে" রোগের,না ওষুধের সেইটেই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না" তখন পাঠকের চোখও বুঝতে পারে দ্যোতনাটা রয়েই গেছে। আজকের একুশ শতকেও যা বিদ্যমান, সমাজের উপরতলার মানুষেরা সমাজের জন্য অনেক কিছু করছেন এই বক্তব্য বিজ্ঞাপিত হলেও আলোর নাচের অন্ধকারটা সেই দ্যোতনার কথাটাকেই প্রতিষ্ঠা করে।

মানব চরিত্র সবসময় শুদ্ধতা খোঁজে,সুখ এর খোঁজে মানুষের নিজেকে বারে বারে স্তোক বাক্য দেওয়ার পাশাপাশি অন্যের দিকে আঙুল তুলে নিজেকে স্বচ্ছ প্রমাণ করার নিরন্তর চেষ্টা দেখা যায় প্রতিনিয়ত, আবার এও দেখা যায় নিজেদের গরিমা প্রকাশ করতে মানুষ ইতিহাস বিকৃত করতেও পিছপা হয় না। কিন্তু বাস্তব চরিত্র অন্য কথা বলে,রক্তের ঋণ কিংবা রক্তের দাগ দুটোই কখনো তোলা যায় না, কাব্য গ্রন্থের "কোন দিকে ফিরাবে চক্ষু" কবিতায় প্রথম পংক্তির শেষ চরণে ব্যবহৃত "এমন সাবান কোনো কারখানায় প্রস্তুত হয় না,যা সেই রক্তের দাগ মুছে দিতে পারে" এই কথাকেই মান্যতা দেয়। রক্তের দাগ বারে বারে ইতিহাস ও অপরাধ দুক্ষেত্রের সাক্ষ্য বহন করে চলে। আবার মানবচরিত্র সুখের অন্বেষণ করতে করতে অনেক সময় হাসির মিষ্টতাতে বিশ্রাম নিতে নিতে সুখ অনুভব করলেও বাস্তব কথাটা কবির কলম বলে চলে "চিত্ত কোনোখানে গিয়ে রক্তহীন বিশ্রাম পায় না" যে বক্তব্য আজও পূর্ণ বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করে।

মানুষ ভাবনার বাস্তবায়নে ব্রতী, কারণ ভাবনার প্রামাণ্য রূপকেই বাস্তবতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর বাস্তবতা না হলে তাকে ঘটনা বলা চলে না এবং প্রত্যেকটি ঘটনার জন্য স্ব স্ব স্থানের প্রয়োজন। এই বৈজ্ঞানিক সত্য আমার খুঁজে পাই কাব্যগ্রন্থের "বুকের ভিতর থেকে" কবিতাতে, "যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে, অথবা চলছে অন্যদিকে----
সবই এই বুকের ভেতর ছিল" এর মাধ্যমে মানুষ ভাবনার বাস্তবায়নে ব্রতী এই সত্যটি যেমন প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনই কবিতার অন্তিম চরণে ব্যবহৃত "প্রণয়, সংগ্রাম, হিংসা---সমস্ত কিছুকে ঘটনায় ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য।" প্রমাণ করে দেয় ঘটনা না ঘটলে তাতে বাস্তবতাও থাকে না, থাকে কেবলই কল্পনা।

মেরুদণ্ডের ঋজুতা ও বিবেক একজন শাসকের, একজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকের অন্যতম হাতিয়ার আর শাসক যদি যান্ত্রিক হয়, নাগরিক যদি যান্ত্রিক হয় তবে তারা অন্ধ সমাজের রূপকার হিসাবে পরিগণিত হয়, কারণ যদি দৃঢ়তা ও বিবেক মেরুদণ্ডের ভিত্তি হয় তবে সেই মেরুদণ্ড পক্ষপাতহীন ভাবে মিত্রতা ও শত্রুতার মধ্যে সমদর্শিতা বজায় রাখতে সক্ষম, কবি" এখন প্রার্থনা" কবিতায় এরকম ঋজু বিবেকবান মেরুদণ্ডের সহ নাগরিকের কামনা করেছেন "যে হাত

তুলেছে ছুরি,যেন সেই উদ্যত কঠিন হাতখানি লোহা তামা পিত্তল কি সিসার বদলে মাংস ও শোণিতে গড়া হয়" এই পংক্তি কবির সেই প্রার্থনাস্বরূপ কামনাকেই মান্যতা দিয়েছে। আবার সেই একই বক্তব্যের প্রতিফলন আবারো দেখতে পাই কবির "ছদ্ম শৈশবের বিরুদ্ধে" কবিতায় যেখানে কবি শৈশবের মোহ কাটিয়ে সত্যের স্বার্থে গর্জন করে উঠতে বলেছেন উন্নত সমাজ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে, আজও আমরা যখন সত্যি বলতে ভয় পাই তখন মনে হয় বয়স বেড়ে গেলেও আমরা আজও মোহাচ্ছন্ন শৈশব কাটিয়ে উঠতে না পেরে কেবলি শৈশবের ছদ্মবেশে সত্য গোপন করে চলেছি অবলীলাক্রমে।

চয়ন ও নির্বাচন একটি গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়, চয়ন ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব থাকে তবে আদর্শচ্যুত লক্ষ্যচ্যুত হয়ে দিগভ্রান্ত হতে হতে হারিয়ে যেতে হয়, আদর্শচ্যুত মানুষ সব কিছু "দুয়ে দুয়ে চার" করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে পৌঁছাবার রহস্যাবৃত রোমাঞ্চের গোলোকধাঁধায় হারিয়ে যায় এই সত্যটাকেই রূপায়িত হতে দেখি কাব্যগ্রন্থের "প্রাকৃত বচন" ও "এরিক শিপটনের ব্যাধি" কবিতার মধ্য থেকে " প্রাকৃত বচন" "কবিতার" চিনে রাখো, কোনটা বিষলতা আর কাকে বলে বিশল্যকরণী" পংক্তির মাধ্যমে কবি যেমন সঠিক চয়নের কথা বলতে চেয়েছেন তেমনিই" এরিক শিপটনের ব্যাধি" কবিতায় "তবু আমি আর ওদের দিকে তাকাব না।
শুধু ওই ফাতনার দিকে চোখ রেখে চুপ করে সারাটা দিন বসে থাকব।"- পংক্তির মাধ্যমে লক্ষ্যস্থির করার বার্তাও দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে আদর্শচ্যুত লক্ষ্যহীন পথচলায় এই কবিতাদ্বয় রসদ জোগায় খুব সুচারুভাবেই।
ভীতির উৎস দুর্বল মনস্তত্ত্ব, আবার মনস্তত্ব প্রজ্ঞাহীনতার জন্ম দেয় এবং বহির্জগত এর আঘাতে দুর্বল মনস্তত্ত্ব আরো দুর্বল হয়ে পড়ে ফলতঃ লড়াই এর ময়দানে আর ফিরে আসা হয় না, তাই মনস্তত্বের গঠন সবল হওয়া দরকার এই তত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায় কাব্যগ্রন্থের "ভিতর-মহল" ও "ভয় করলেই ভয়" কবিতাদ্বয়ে, "ভিতর মহল" কবিতায় "তুমি যত হাততালি-জমানো ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাও, ততই আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেড়ে যায় নিজের উপর"পংক্তি একদিকে সবল মনস্তত্বের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে তেমনই আবার "ভয় করলেই ভয়" কবিতার "ভয় করলেই ভয়, নইলে দেখো কিচ্ছু না, কাঁচকলা" সেই সবল মনস্তত্ত্বের

তত্ত্বকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। আবার ভীতি বা ভয়ের অপর উৎসস্থল হল লোভজাত অপরাধমনস্কতা, অপরাধীর মনস্তত্ত্ব বিচার করলে অন্তত শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অপরাধের উৎসস্থল লোভ। যদি লোভের মৃত্যু সম্ভব হয় তাহলে একইসাথে ভয়ও নির্মূল হয়ে যায়, এই তত্ত্বকেও কবি তার কলমে সুচারু ভাবে রূপ দিয়েছেন কাব্যগ্রন্থের "জোড়া খুন" কবিতার মাধ্যমে। যেখানে কবি বলেছেন-

"আমার সামনে ছিল ভয়-
আমি ভেবেছিলুম,
একে একে তাদের মোকাবিলা করব।
কিন্তু তার আর দরকার হল না, একজনকে আক্রমণ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখতে পেলুম,
অন্যজনও ফতুর হয়ে গেছে।"

যার কাছে কিছু প্রত্যাশা করা হয়না অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় সেই ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী সবার আগে এগিয়ে আসে,সেটা জীবনের জলসাঘরে হোক কিংবা বৃহত্তর দিনবদলের মঞ্চ, কবির কলমে এই বাস্তবতাও ধরা পড়েছে যথাক্রমে "টেল এন্ডার"ও "রক্তপাত, পড়ন্ত বেলায়" কবিতাদ্বয়ে, প্রথম কবিতায় "সবচাইতে কম আস্থাভাজন বলেই সবচাইতে ভয়ংকর চেহারায় দেখা দিতে যার বাধা নেই" কিংবা দ্বিতীয় কবিতায় "তুমি আমার এগারো-নম্বর খেলোয়াড়;কিন্তু প্রমোশন দিয়ে তোমাকে আমি তিন নম্বরে তুলে আনলুম।
তোমার স্বার্থে নয়,
দলের স্বার্থে।" এই পংক্তিগুলো সেই বাস্তবতাকেই সমর্থন করে সাবলীল ভাবেই। অন্ধ স্তাবকতা ও সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারার অক্ষমতা একটি গোটা সমাজের অবক্ষয়ের কারণ আবার যদি সততা সেই সত্যকে স্বীকার করে নিতে পারে তবে দিনবদলও সম্ভব এই বার্তাকেই কবি তাঁর "উলঙ্গ রাজা" কবিতাতে সাবলীল ভাবেই তুলে ধরেছেন, তবে "উলঙ্গ রাজা" কবিতার সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা এটাই যে সেখানে কবি একটি শিশুকে উত্তর হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন যাকে ভবিষ্যতের আবহতেও খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং যে অচলায়তনের আগল ভাঙতে সক্ষম" "রাজা তোর কাপড় কোথায়?" এই প্রশ্নের মাধ্যমে ।